বাংলা নাটক

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

সম্পাদনা

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

তপন মন্ডল | দীপঙ্কর মল্লিক

বাংলা নাটক

ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার

সম্পাদনা

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

তপন মন্ডল ● দীপঙ্কর মল্লিক

দিয়া পাবলিকেশন

Bangla Natak : Oitihya O Uttaradhikar

Edited by : Bidisha Ghosh Dastidar
Tapan Mandal & Dipankar Mallik

Published by
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415
e-mail : diyapublication@gmail.com || diyapublication64@gmail.com
website : https://diyapublication.in/
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা
facebook page : https://www.facebook.com/diyapublicaton/
প্রকাশনা ও বিপণন সংক্রান্ত কথা : কৌস্তভ বিশ্বাস

ISBN : 978-93-92110-00-9

প্রথম প্রকাশ
১২ শ্রাবণ ১৪২৯ || ২৯ জুলাই, ২০২২ || শুক্রবার

শোভন সংস্করণ : মূল্য ৫০০

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব : বিষয়ানুসারী প্রবন্ধ—সময়-সমাজ-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার

মনোজ মিত্র ও সৌমিত্র বসুর নাটকে ঐতিহ্য ও
উত্তরাধিকারের ছায়াপাত ॥ সুরজিৎ মণ্ডল
৯

উনিশ শতকের নির্বাচিত বাংলা সামাজিক নাটকে নিম্নবর্গীয়
চরিত্রের ভাষা-সংলাপ ॥ অভি কোলে
১৬

বাংলা দর্পণ নাটকের ধারা ॥ তাপস সাহা
২৫

নির্বাচিত বাংলা নাটকে প্রতিবাদী কৃষক জীবন ॥ অসীম হালদার
৩৬

বাংলা পৌরাণিক নাটকের ধারা এবং তার উত্তরাধিকার ॥ গার্গী চট্টোপাধ্যায়
৪২

পণপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি : প্রেক্ষিত উনিশ শতকের
বাংলা নাটক-প্রহসন ॥ সাথী ত্রিপাঠী
৪৭

রবীন্দ্র নাট্যচিন্তার উন্মেষপর্ব ও শেকসপিয়ার চর্চা ॥ সৃজন দে সরকার
৬০

দ্বিতীয় পর্ব : নাটককার-নাট্যকার ও নাটককেন্দ্রিক প্রবন্ধ

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১.১১.১৮৭৩)

সমাজবাস্তবতার নাটক ‘নীলদর্পণ’ : একটি ঐতিহাসিক
পর্যালোচনা ॥ শিপ্রা বিশ্বাস
৬৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১)
প্রাণ-প্রবাহের ভগীরথ : রবীন্দ্র-নাটকের তিন চরিত্র ॥ সৌরভ ঘরামী
৭৪
রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' : একটি ব্যতিক্রমী নাটক ॥ সুস্মিতা সাহা
৮১

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৯.৭.১৮৬১-১৭.৫.১৯১৩)
'সাজাহান' নাটকে দিলদার : এক ব্যতিক্রমী অনৈতিহাসিক চরিত্র ॥ অস্মিতা মিত্র
৮৪

সুকুমার রায় (৩.১০.১৮৮৭-১০.৯.১৯২৩)
সুকুমার রায়ের নাটক 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' রামায়ণী কথার নবনির্মাণ ॥ গোবিন্দ মণ্ডল
৮৯

তুলসী লাহিড়ী (৭.৪.১৮৯৭-২২.৬.১৯৫৯)
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা নাটক 'পথিক' : শ্রমিক আন্দোলন ॥ পাপিয়া নস্কর
৯৩

মন্মথ রায় (১৬.৬.১৮৯৯-১৯৮৮)
মন্মথ রায়ের 'কারাগার' : পুরাণের আলোকে স্বদেশপ্রেমের বার্তা ॥ সৌমিলি দেবনাথ
৯৭

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৯০)
'তরঙ্গ' : শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের ঢেউ ॥ চিত্রা সরকার
১০০

বুদ্ধদেব বসু (৯.১১.১৯০৮-১৮.৩.১৯৭৪)
'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' ও 'প্রথম পার্থ' : ঐতিহ্য, উত্তরাধিকার ও স্বাতন্ত্র্য ॥ সুস্মিতা ঘোষ
১০৯

শম্ভু মিত্র (২২.৮.১৯১৫-১৯.৫.১৯৯৭)
সনকা চরিত্র : প্রসঙ্গ মনসামঙ্গল ও 'চাঁদ বণিকের পালা' ॥ বিপাশা বসাক
১১৫
বেঁচে থাকার সংকট থেকে উত্তরণ : প্রসঙ্গ 'চাঁদ বণিকের পালা' ॥ মধুসূদন সাহা
১২৪

শম্ভু মিত্রের 'চাঁদ বণিকের পালা'—ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের
সপ্রসঙ্গ বিনির্মাণ || অজয় কুমার দাস
১৩৩

বিজন ভট্টাচার্য (১৭.৭.১৯১৭-১৯.১.১৯৭৮)

অস্থির সময়, রাজনৈতিক বিপন্নতা ও মন্বন্তরের শিল্পিত
ক্যানভাস : প্রেক্ষিত 'নবান্ন' || গৌতম দাস
১৫১

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' : আশা ও নিরাশার
সমান্তরাল স্রোত || দেবারতি মল্লিক
১৫৯

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৫.৮.১৯২২-১০.১০.১৯৭১)

'বহিপীর' নাটক : মূল্যবোধের সংঘাত || আশিস রায়
১৬৬

বাদল সরকার (১৫.৭.১৯২৫-১৩.৫.২০১২)

অ্যাবসার্ডিটি, মধ্যবিত্ত জীবনের
অন্তঃসারশূন্যতা : 'এবং ইন্দ্রজিৎ' || তাপস পাল
১৭১

বাদল সরকারের 'সারারাত্তির' (১৯৬৩) নাটকে দাম্পত্য
সম্পর্কের স্বরূপ : একটি ভাষাগত নিরীক্ষা || কৌশিককুমার দত্ত
১৭৬

আত্মঘাতীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ : 'আট বছর আগের
একদিন' থেকে 'বাকি ইতিহাস' || শ্রিয়া দত্ত
১৮৬

লোকনাথ ভট্টাচার্য (৯.১০.১৯২৭-২৩.৩.২০০২)

লোকনাথ ভট্টাচার্যের নাট্যভুবন || বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য
১৯৩

মমতাজ উদ্দিন আহমদ (১৮.১.১৯৩৫-২.৬.২০১৯)

ব্রাত্য নারী জীবনের উত্তরাধিকার
প্রসঙ্গ 'কী চাহ শঙ্খচিল' || চন্দ্রাণী মুখার্জী
২০৩

মনোজ মিত্র (২২.১২.১৯৩৮)

মনোজ মিত্রের নাটকে ঐতিহ্যের অনুবর্তন : প্রসঙ্গক্রমে
ছায়ার প্রাসাদ ও অপারেশন ভোমরাগড় || আঙ্গুরা খাতুন
২০৮

মনোজ মিত্রের 'অশ্বত্থামা' : পুরাণে প্রবেশ ও প্রস্থান ॥ দেবদীপ দাস
২১৫
মনোজ মিত্রের নাটকে নাট্যকারের জীবনদর্শন ॥ গৌতম গায়েন
২২২
মনোজ মিত্র : 'তক্ষক'—জীবনের কাছে মরণের আত্মসমর্পণ ॥ দীপঙ্কর মল্লিক
২২৮
স্বপ্নময় চক্রবর্তী (২৪.৮.১৯৫১)
'ইস্টু জিস্টু' : সময় কথা বলে ॥ সৌভিক পাঁজা
২৩৫
সীমা মুখোপাধ্যায় (৫.১২.১৯৫৯)
সীমা মুখোপাধ্যায়ের 'বিকল্প' নাটকে মাতৃত্বের বিকল্পহীনতা ॥ মৌমিতা বিশ্বাস
২৪০
ব্রাত্য বসু (২৫.৯.১৯৬৯)
মানুষের খোঁজে ব্রাত্য বসুর ভাইরাস্ এম্ ॥ সৌমি দাশ
২৪৭
ব্রাত্য বসুর 'মীরজাফর' : ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার ॥ দীপঙ্কর মল্লিক
২৫২
ব্রাত্য বসুর 'অশালীন' ও 'কৃষ্ণগহ্বর' : পাঠ-প্রতিক্রিয়া ॥ সাবির মণ্ডল
২৬০
তৃতীয় পর্ব : নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনা
স্টার থিয়েটারে পেশাদারি থিয়েটারের স্টার : মহেন্দ্র গুপ্ত ॥ অনিমেষ গোলদার
২৬৬
'আন্তিগোনে' থেকে 'মিসেস আর পি সেনগুপ্ত'
নারীর প্রতিবাদ ও মুক্তি-আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ স্বর ॥ অলোকদ্যুতি নন্দী
২৭২
নারী রচিত বাংলা নাটকের ধারায় সীমা মুখোপাধ্যায়ের নাটক ॥ অনুরণ বসুরায়
২৭৮
চতুর্থ পর্ব : নাট্যসমালোচনা
নাটক 'শের আফগান' : পঞ্চাশ বছর আগে ও পরে ॥ সুশীল সাহা
২৮৪
গীতিকা থেকে নাটকে উত্তরণ : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা ॥ বৈশাখী পাঠক
২৮৭
প্রাবন্ধিক পরিচয়
২৯১
দিয়ার সাহিত্যচর্চা
২৯৩

উনিশ শতকের নির্বাচিত বাংলা সামাজিক নাটকে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের ভাষা-সংলাপ

অভি কোলে

সারসংক্ষেপ

মানবজীবন ও সমাজজীবনের দলিল রূপে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে নাটকই হল বাঙ্‌ময় শিল্প। নাটক দৈনন্দিন জীবনচর্চার সুগভীর ভাব তরঙ্গ নিয়ে রচিত হয়। আর সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আবেগ-অনুভূতি, আচরণ প্রভৃতি সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। সংলাপে চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্য চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও মনস্তাত্ত্বিক দিক ফুটে ওঠে। স্বভাবের অনুকরণে সৃষ্ট নাটকের মূল কথায় হল উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক মানব জীবন কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব সংক্ষুব্ধ কাহিনি। অন্যদিকে অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্যতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয়, আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা, জীবিকার প্রয়োজনে অসৎ কর্ম প্রবণতা প্রভৃতি থেকেই এই সমস্ত দলিত, অস্পৃশ্য, অবহেলিত, শোষিত জাতি-উপজাতির মানুষের সৃষ্টি হয়েছে, যারা সমাজের নিম্নবর্গীয় চরিত্র বলে চিহ্নিত। এদের জীবনযাত্রার মানও তাই নিম্ন প্রকৃতির। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই যথার্থভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম ঘটে। এই উদ্ভবের নেপথ্যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য, দেশি-লৌকিক অভিনয় কলা এবং ইউরোপীয় মঞ্চাভিনয় ও ইংরেজি নাট্যসাহিত্য এই ত্রিবেণী ধারার প্রভাব বর্তমান।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৌলিন্য সমস্যা, বিধবাবিবাহ, পণপ্রথা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, মদ্যপান, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে বাংলার সমাজে। এই সামাজিক সমস্যাগুলি অবলম্বন করে যে সমস্ত সামাজিক নাটক লেখা হয়েছিল তাতে বেশ কিছু নিম্নশ্রেণির চরিত্র দেখা যায়। এইসব নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মুখে মূলত চলিত ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে সংলাপ হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ ও প্রাণবন্ত। এই পর্বে আমি তিন খ্যাতিমান নাট্যকারের সামাজিক নাটকগুলিতে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মুখে ব্যবহৃত সংলাপের ভাষা বৈশিষ্ট্য বিচার-বিশ্লেষণ করেছি। রামনারায়ণ তর্করত্নের (১৮২২-১৮৮৬) সামাজিক নাটকগুলিতে নাট্যকার সহজ স্বাভাবিক মেয়েলি ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, রঙ্গ-রসিকতা, বাগধারার ব্যবহার অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছে তাদের সংলাপকে। নাট্যকার সাধারণ চরিত্রের মুখে গ্রাম্য ভাষা ও তার বাঁকা উচ্চারণ অবিকল উদ্ধার করেছেন। সংলাপগুলোতে রাঢ়ি ও বঙ্গালি উপভাষার পাশাপাশি লৌকিক শব্দ, প্রবাদ, অর্ধতৎসম শব্দ প্রভৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯-১৮৭৩) এর সমাজের নিম্নশ্রেণির নরনারী সঙ্গে তার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ।

'নীলদর্পণ' নাটকে নিম্নশ্রেণির চরিত্রের সংলাপে নদিয়া-রাঢ় অঞ্চলের পাশাপাশি খুলনা, যশোহর অঞ্চলের উপভাষা মিশ্রিত হয়েছে। উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে কাটানো গিরিশচন্দ্র ঘোষের (১৮৪৪-১৯১১) সামাজিক নাটকগুলিতে তদ্ভব শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গি আশ্রিত কথ্যভাষা পাহারাওয়ালা, শুড়ী, মাতাল, মুটে, ভৃত্য, খেমটাওয়ালী, পরিচারিকা প্রভৃতি নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলিকে করে তুলেছে জীবন্ত ও প্রাণবন্ত।

উনিশ শতকে যে সমস্ত বাংলা সামাজিক নাটক রচিত হয়েছিল তা মূলত তৎকালীন সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং সংস্কারমুখী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে নাট্যকারের নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলোকে প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করতে তাদের প্রধান অস্ত্রই হল ভাষার সাবলীলতা ও বৈচিত্রময়তা। শ্রেণীভেদে, ভাষাভেদে এই ঔচিত্যবোধ ছিল বলেই তারা নিম্নবর্গের সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা, সামাজিক উপভাষা ও জনভাষাকে সুচারুরূপে প্রয়োগ করেছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন।

সূচক শব্দ

উনিশ শতক, নিম্নবর্ণ, গ্রাম্য কথ্য ভাষা, সামাজিক উপভাষা, সমাজ মনস্তত্ত্ব।

মূল প্রবন্ধ

মানবজীবন ও সমাজজীবনের দলিলরূপে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মধ্যে নাটকই হল বাঙ্ময় ও অনেক বেশি ক্রিয়াশীল (Active) এবং প্রায়োগিক শিল্প (Applied art)। মানবজীবনের দুরাধিগম্য দৈনন্দিন জীবনচর্চার সুগভীর ভাবতরঙ্গ নিয়েই রচিত হয় নাটক। তাই আধুনিক যুগে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এই সাহিত্যিক শাখাটি সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই যথার্থভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম ঘটে। এই উদ্ভবের নেপথ্যে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য, দেশি-লৌকিক অভিনয়কলা এবং ইউরোপীয় মঞ্চাভিনয় ও ইংরেজি নাট্যসাহিত্য এই ত্রিবেণি ধারার প্রভাব বর্তমান। উনিশ শতকের বেশিরভাগ বাংলা নাটকে কৌলীন্য সমস্যা, বিধবাবিবাহ, নব্যবঙ্গের উচ্ছৃঙ্খলতা, মদ্যপান, গণিকা সেবা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, জমিদারদের লোলুপতা, ব্রাহ্মধর্ম, হিন্দুধর্মের সংঘাত প্রভৃতির মতো সামাজিক-পারিবারিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত। তাই সেখানে সমাজের উচ্চশ্রেণির পাশাপাশি নিম্নস্তর থেকে প্রচুর শ্রেণি চরিত্র উঠে এসেছে। উনিশ শতকের নগর ও গ্রাম জীবনের বিকারগ্রস্ত অসুস্থ জীবন চিত্রকে নাট্যকারেরা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কশাঘাতে এবং লঘু রসাত্মক কাহিনির মোড়কে জীবন্ত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থাপিত করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রধান হাতিয়ার হল সংলাপের তীক্ষ্ণতা-সাবলীলতা। বিশেষত নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলির সংলাপ সৃষ্টিতে নাট্যকারদের অনেক বেশি স্বভাব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বভাবের অনুকরণ নাটক সৃষ্টির মূল কথা। উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক মানবজীবনকন্দ্রিক দ্বন্দ্ব-সংক্ষুব্ধ কাহিনিই হল নাটক। নাটক সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণার সামান্য প্রভেদ রয়েছে। গ্রিক শব্দ 'Deed' থেকে 'Drama' শব্দের উদ্ভব। যার বাংলা প্রতিশব্দ হল নাটক। আবার সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নৃত্য' কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে। এর অপর নাম 'নাট' যা হতে নাটক শব্দটির সৃষ্টি। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য', 'রূপক' বা 'অবস্থানুকৃতিনাট্যম' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল তাঁর 'পোয়েটিক্স'

গ্রন্থে নাট্যশিল্পকে সংজ্ঞায়িত করেছেন মানবিক কর্মবৃত্তের অনুকরণ রূপে 'The imitation (mimesis) of an action." ভারতীয় নাটকের প্রাচীন ঐতিহ্য হল সংস্কৃত সাহিত্য যেখানে ভাস, কালিদাস, বিশাখা দত্ত, শূদ্রক, ভবভূতির মতো খ্যাতিমান নাট্যকারগণ আবির্ভূত হয়ে বহু উৎকৃষ্ট নাটক উপহার দেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের জন্মলগ্নে সংস্কৃত এবং ইংরেজি উভয় প্রকার নাটকের অনুবাদ হলেও সংস্কৃতের পাল্লাই বেশি ভারী ছিল।

নাটক রচনার ক্ষেত্রে যে কয়টি শর্ত রয়েছে তার প্রধান তিনটি হল কাহিনি, চরিত্র ও সংলাপ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যদি হয় সৌন্দর্যসৃষ্টি, তাহলে নাটকের ক্ষেত্রে এই সৌন্দর্য আখ্যানকে অবলম্বন করে চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে সার্থকতা লাভ করে। চরিত্র সমূহের মানসিক সংঘাত ও আলোড়ন তাঁদের অন্তর্লোকের বিচিত্র রহস্য উদ্‌ঘাটনে সাহায্য করে। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থের ষষ্ঠ ও পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি নাটকের কাহিনিকে মুখ্য ধরলেও শেকসপিয়র অবশ্য চরিত্রকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। চরিত্র প্রসঙ্গে W.H. HUDSON বলেছেন—"Characterisation is the really Fundamental and lasting element in the greatness of any dramatic work." সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রেও নায়ক-নায়িকা পার্শ্বচরিত্রের লক্ষণ বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। সেখানে ধীর ললিত, ধীর শান্ত, ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত এই চার প্রকার নায়ক, আট প্রকার নায়িকা ছাড়াও প্রতিনায়ক, বিদূষক, বিট, দূত, কুঞ্চকী প্রভৃতি নাট্যচরিত্রের কথা বলা হয়েছে।

সাহিত্যে রস সৃষ্টির মাধ্যম যদি হয় ভাষা। তবে নাট্যকাহিনিকে চরিত্রের মধ্য দিয়ে পাঠক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করার প্রাচীন ও একমাত্র মাধ্যম হল সংলাপ (Dialogue)। সংলাপ নাট্যশিল্পের এমন এক বিশিষ্ট লক্ষণ যা সাহিত্যের অনান্য শাখা থেকে নাটককে বাহ্যত পৃথক করেছে। সংলাপ শুধু চরিত্রের কথা নয়, নাট্যকারের রসসৃষ্টি বা তত্ত্ব প্রচারের প্রধান বাহন। সংলাপের ওপরেই নাট্যদ্বন্দ্ব, বাস্তব পরিবেশ, চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আবেগ-অনুভূতি-আচরণ ইত্যাদি নির্ভর করে। তাই অধ্যাপক নিকল সংলাপকে নাটকের প্রাণ বলেছেন—"Action is to drama what is body is to man in its language; resides the dramaós soul." সংলাপ আড়ষ্ট হলে নাট্যধর্ম ব্যাহত হয়। তাই সংলাপ যেমন তীক্ষ্ণ, সাবলীল, চরিত্রানুগামী হবে, তেমনি হবে নাটকীয় ও গতিশীল। শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গান এমনকী প্রয়োজনবোধে অশ্লীল শব্দ মিশিয়ে সংলাপে জীবানাভাস আনা হয়।

মহামতি অ্যারিস্টটল নাটকের পরিকাঠামো নির্মাণে সংলাপের গুরুত্বকে স্বীকার করে তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ভাষা, শব্দ ও রীতির বিশদ আলোচনা করেছেন। ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রেও সংলাপের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সংলাপ 'বৃত্তি' বলে উল্লেখিত। 'সাহিত্যদর্পন'কার বিশ্বনাথ কবিরাজের মতে "সংলাপঃ স্যাদ গভীরোক্তির্নানা ভাব সমাশ্রয়ঃ।" আবার আচার্য ভরত তাঁর 'নাট্যশাস্ত্রে' নাট্যচরিত্রের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছেন। সেখানে তিনি নিম্নজাতির ভাষাকে বিভাষা এবং স্ত্রীলোক, নীচব্যক্তি, মাতাল, ভৃত্য প্রভৃতির ভাষাকে প্রাকৃত বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রাকৃত বা চলিত ভাষাই নাটকে সাবলীল ও জীবন্ত হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত ভারতীয় ও পাশ্চাত্য নাটকের সংলাপ ছিল মূলত পদ্য। কিন্তু কালক্রমে বাস্তবধর্মী নাটকের ভাষা হয়ে উঠেছে গদ্য ও বাস্তব উপাদান নির্ভর। প্রথম পর্বের বাংলা মৌলিক নাটকে গদ্য ও পদ্য ভাষার মিশ্রণ দেখা যায়। পরবর্তীকালে রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত বা দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের নাটকে সংলাপ রচনায় অনেক বেশি সার্থকতা মৌলিকতা দেখিয়েছেন। গ্রাম্য ভাষা, স্ত্রী চরিত্রের সংলাপ, বাস্তবধর্মী কথ্য ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য এনেছেন। বিশেষ করে তোরাপ, আদুরী, রাইচরণ, পদী, হানিফ, পুঁটি, ক্ষেত্রমণি রেবতী, রঘুয়া প্রভৃতি ভদ্রেতর চরিত্রগুলি গ্রাম্য, কথ্য, অশুদ্ধ ও অমার্জিত ভাষা রূপের মধ্য দিয়েই এত স্বচ্ছন্দ, বাস্তবধর্মী ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা লোকসাহিত্যের ধারায় নিম্নশ্রেণির টাইপ চরিত্রের উপস্থিতি থাকলেও একেবারে প্রারম্ভিক পর্বের বাংলা নাটকে তারা জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রমুখ নাট্যকারদের রচনায় দরিদ্র কৃষক, চাকর, মজুর, দাসী, ডোম, মুটে, কাহার, মুচি, বারাঙ্গনা, গোয়ালিনী, পাহারাদার, মাতাল প্রভৃতি প্রচুর নিম্নশ্রেণির টাইপচরিত্র দেখা যায়। তাদের সংলাপে গ্রাম্য কথা ভাষা, লৌকিক শব্দ ও চরিত্রানুগ ভাষা প্রয়োগ করে নাট্যকারগণ বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে গণনাট্য আন্দোলন ও দুর্ভিক্ষের প্রেক্ষাপটে রচিত 'নবান্ন', 'দেবীগর্জন', 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার' প্রভৃতি নাটকে নিম্নবর্গীয়-শ্রমজীবী চরিত্রের শ্রেণিসংগ্রামের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় ভাবাত্মক নাটক রচিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহের সূচনা হয়। ১৮৬০ সালে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পন' নাটকে নীল চাষিদের ওপর সাহেবদের অত্যাচারের করুণ ও বাস্তবচিত্র এঁকে বাংলা নাটকের নতুন দরজা খুলে দেন। এই শতাব্দীতেই বাঙালি একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন শুরু হয়। এই পটভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ আবির্ভূত হয়ে সামাজিক দুর্নীতি, পারিবারিক বিরোধ, পণপ্রথা, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, মদ্যপান, জালিয়াতি, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অপরাধমূলক কার্যকলাপগুলিতে তাঁর বিখ্যাত 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'সভ্যতার পান্ডা', 'বেল্লিক বাজার' প্রভৃতি নাটক-প্রহসনের বিষয় করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকের শেষদিকে স্ত্রী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষার প্রসার বা বিধবা-বিবাহের মতো সামাজিক সংস্কার বাড়তে থাকে। এর পাশাপাশি ব্রাহ্মদের আন্দোলন, হিন্দুদের গোঁড়ামী, ধর্মধ্বজাধারীদের ভণ্ডামি-অনাচার, ভোটরঙ্গ, ভণ্ডদেশপ্রেম বাঙালি সমাজে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। এই সময় রক্ষণশীল মানসিকতার দুই নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অমৃতলাল বসু তাঁদের রচনার এই বিষয়গুলি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মকভাবে তাঁদের রচনায় উপস্থাপিত করেছেন।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে কৌলিন্য সমস্যা, বিধবাবিবাহ, পণপ্রথা, স্ত্রী-স্বাধীনতা, মদ্যপান, একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙন, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে বাংলার সমাজে। এই সামাজিক সমস্যাগুলি অবলম্বন করে যে সমস্ত নাটক লেখা হয়েছিল তাতে বেশ কিছু নিম্নশ্রেণির চরিত্র দেখা যায়। নাট্যকারদের অভিজ্ঞতা ও

সহানুভূতিতে এই সমস্ত চরিত্র সজীব ও বাস্তবধর্মী হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে চরিত্রের সামাজিক ও মানবিক রূপটি উজ্জ্বল হয়ে আছে। এইসব নিম্নবর্গীয় চরিত্রের মুখে মূলত চলিত ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষার প্রয়োগ ঘটেছে। ফলে সংলাপ হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ ও প্রাণবন্ত। তিন খ্যাতিমান নাট্যকারের সামাজিক নাটকগুলিতে নিম্নবর্গীয় চরিত্র ও তাদের মুখে ব্যবহৃত সংলাপের ভাষা বৈশিষ্ট্য আলোচিত হল।

১.

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২ ১৮৮৬)

আলোচ্য নাটক : ১. কুলীনকুলসর্বস্ব (১৮৫৪), ২. নবনাটক (১৮৬৬)।

বাংলা নাটকের প্রারম্ভিক পর্বে বিচিত্র প্রতিভাধর লেখক ও নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। রক্ষণশীল মানসিকতার হলেও বিদ্যাসাগরের সান্নিধ্যে এসে কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের মতো সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে কলম ধরলেন। শুধু তাই নয়, চরিত্রের সংলাপ নির্মাণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনার চার বছর পূর্বে বাংলা নাটকে চলিত ভাষা প্রয়োগ করে তিনি সবার নজর কেড়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকে নারী চরিত্রগুলির সহজ স্বাভাবিক মেয়েলিভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, রঙ্গ-রসিকতা, বাক্‌ধারার ব্যবহার অত্যন্ত জীবন্ত করে তুলেছে তাদের সংলাপকে। নাট্যকার সাধারণ চরিত্রের মুখে গ্রাম্য ভাষা ও তার বাঁকা উচ্চারণ অবিকল উদ্ধার করেছেন। ভৃত্য ভোলার সংলাপের মধ্য দিয়ে কলকাতা ও পূর্ববঙ্গের এক বিশেষ অঞ্চলের মানুষের ভাষাভঙ্গি চোখে পড়ে।

নীচুজাতের গ্রাম্য ভৃত্যের মুখে যে কথ্য ভাষা প্রয়োগ করা উচিত, নাট্যকার তা সাবলীল ভাবেই করেছেন। যেমন—"মোগার কপালে দুক নেকেছে গোঁসাই।/খাট্টি খাট্টি মনু এট্টুবস্টি পাই নাই।।" আবার 'নবনাটক'-এ নারী চরিত্র ও তাদের সংলাপ উভয়ই প্রাণবন্ত হয়েছে। বিশেষ করে ভৃত্য মদো, রসময়ী, ভগি-সাবির মতো নিম্নশ্রেণির চরিত্রগুলির মধ্যে আঞ্চলিক কথ্য ভাষার সঙ্গে তাদের নিজস্ব উচ্চারণ ভঙ্গি সজীবতা পেয়েছে। অন্তঃপুরের দাসীদের মুখের ভাষা ভগি ও সাবির সংলাপে প্রাণ পেয়েছে। এদের সংলাপে রাঢ়ি ও বঙ্গালী উপভাষার পাশাপাশি, লৌকিক শব্দ, প্রবাদ, অর্ধতৎসম শব্দ প্রভৃতির ছাপ সুস্পষ্ট। যেমন—

১. **লৌকিক শব্দ :** কেচ্ছে (কাস্তে), শালা, বীন (বেয়ান), ঝকমারি, ছুঁড়ী, খেঙরা, ধুম, ধেড়েরোগ ইত্যাদি।

২. **মেয়েলি শব্দ :** মিনসে, মাগী, ওলো, ওগো, হ্যাঁগো প্রভৃতি।

৩. **প্রবাদ-প্রবচন :** (ক) ওট ছুড়ী তোর বে।
(খ) বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।

৪. **উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য :**

(ক) স্বরসঙ্গতি (তামাক > তামুক / খেতে > খাতি / সাধ্য > সাধ্যি / নাও > নেও)।

(খ) সমীভবন (কর্ম > কম্ম / একটি > এট্টি / কতদূর > কদ্দূর / গল্প > গপ্প)।

(গ) অল্পপ্রাণীভবন (গাছ > গাচ / কোথা > কোতা)।

(ঘ) সর্বনামের আঞ্চলিক রূপ মুই (আমি) / মোগার (আমাদের)]

(ঙ) শব্দের আদিতে 'এ' এর পরিবর্তে 'অ্যা' উচ্চারণ (ঠেশ > ঠ্যাশ/ বিয়ে > ব্যা/ পেট > প্যাট)।

(চ) ক্রিয়াপদের উত্তম পুরুষে 'লুম' এবং 'লেম' এর ব্যবহার (ছিলুম / পেলেম / বাঁচলুম/ ভাবলেম)।

২.

দীনবন্ধু মিত্র (১৮১৯—১৮৭৩)

আলোচ্য নাটক : ১. নীলদর্পণ (১৮৬০), ২. নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩), ৩. লীলাবতী (১৮৬৭), ৪. কমলে কামিনী (১৮৭৩)

মধুসূদনের সমসাময়িককালে বাংলা নাট্যজগতের এক উজ্জ্বল প্রদীপ হলেন দীনবন্ধু মিত্র। তাঁর নাটকে ব্রাহ্ম আন্দোলন, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যার পাশাপাশি নীল আন্দোলনের মতো স্বাদেশিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে। ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও সমাজের নিম্নশ্রেণির নর-নারী সম্পর্কে তার পরিচয় ছিল ঘনিষ্ঠ। তাই এদের ভাবভঙ্গি, স্বভাব-চরিত্রকে সহানুভূতি দিয়ে সুদক্ষ শিল্পীর মতো এঁকেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান হাতিয়ারই ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সংলাপ নির্মাণ। বিশেষ করে ভদ্রেতর চরিত্রের সংলাপ সেই নৈপুন্যের সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকে তোরাপ, আদুরী, রাইচরণ, রেবতী, ক্ষেত্রমণি, পদী প্রভৃতি ভদ্রেতর চরিত্রের ভাষা সাবলীল, চরিত্রানুগ ও প্রাণবন্তভাবে এসেছে।

এই সমস্ত চরিত্রের সংলাপে নদীয়া-রাঢ় অঞ্চলের পাশাপাশি খুলনা, যশোহর অঞ্চলের উপভাষা মিশ্রিত হয়েছে। এছাড়া 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে নিম্নশ্রেণির বাহকগণের সংলাপে কাহার গোষ্ঠীর মুখের ভাষা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আবার 'লীলাবতী' নাটকে উড়ে চাকর রঘুয়ার সংলাপে ওড়িয়া ভাষা ও শব্দ সজীবতা পেয়েছে। যেমন—"বাবু মানে আপনাঙ্কো ভালুপিলা সাজাউচি আউ কঁড়।" তবে 'নীলদর্পণ' এর বয়স্কা দাসী আদুরীর সংলাপ প্রাণোচ্ছলতা, সহানুভূতি ও গ্রাম্য রঙ্গ-রসিকতায় পূর্ণ। সে যখন সাহেবদের সম্পর্কে বলে—"মাগো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। থু! থু! গোন্দো। প্যাজির গোন্দো।" তখন তার শ্রেণি চরিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নাটকে শোষিত কৃষক সমাজের প্রতিনিধি তোরাপের সাহসিকতা, প্রতিবাদী মনোভাব, সহানুভূতি, রসবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য তার সংলাপকে তীক্ষ্ণ ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। একটি দৃষ্টান্ত—"সমিন্দিরি য়্যাকবার ভাতার মারির মাটে পাই, এমনি থাপ্‌পোড় ঝাঁকি, সুমুন্দিরি চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই।"

সে মুসলমান কৃষক। তাই তার সংলাপে প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তবে নাট্যকার এই সমস্ত নিম্নশ্রেণির গ্রাম্য চরিত্রগুলি আঁকতে গিয়ে যে লৌকিক শব্দ, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ, ছড়া, বাগ্‌ভঙ্গি, মেয়েলি ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত হয়েছে। সেক্ষেত্রে শালীনতার গন্ডি তিনি মানেননি। উদাহরণ—

১. **লৌকিক শব্দ :** চাবালি (চাবুক), থাপপোড় (চড়), ফ্যাবা, ভাতার, আঁটকুড়ি, মিনসে, পেটপোড়া, ড্যাকরা, কসবি (বেশ্যা), মাগ প্রভৃতি।

২. **আরবি-ফারসি শব্দ :** ঘোদা, আসমান, কসম, জানকবুল।

৩. ছড়া : ব্যারাল চোকো হাঁদা হেমদো
নীল কুটির নীল মামদো।

৪. প্রবাদ : (ক) চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।
(খ) ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর।

এছাড়াও এদের সংলাপে রাঢ়ি এবং বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। যেমন—সমীভবন (কর্তা > কত্তা), স্বরসঙ্গতি (বুকে > বুকি), ঘোষীভবন (পরানটা > পরানডা), অল্পপ্রাণীভবন (গাছ > গাচ) শব্দের আদি 'এ' এর 'অ্যা' রূপে উচ্চারণ (পেরেক > প্যারেক / খেদ > খ্যাদ), শব্দের আদিতে 'র', 'ল' এর 'ন' প্রবণতা (রাত > নাত / লোক > নোক) প্রভৃতি।

৩.

গিরিশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪—১৯১১)

আলোচ্য নাটক : ১. প্রফুল্ল (১৮৮৯), ২. হারানিধি (১৮৯০),৩. মায়াবসান (১৮৯৭), ৪. বলিদান (১৯০৫), ৫. শাস্তি কি শান্তি (১৯০৭)

প্রখ্যাত নট, নাট্যকার ও নাট্য পরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বাংলা রঙ্গামঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ। পৌরাণিক নাটকে জনপ্রিয়তা অর্জন করলেও তাঁর সামাজিক নাটকগুলি প্রশংসার দাবি রাখে। পণপ্রথা, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ, মদ্যপান, খুন-জখম, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা, মামলা, ভাতৃদ্বন্দ্ব প্রভৃতির মতো সামাজিক ও পারিবারিক সমস্যা অবলম্বনে তিনি পাঁচটি নাটক রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র সারা জীবন উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে কাটিয়েছেন। তাই তার সামাজিক নাটকের প্রধান অবলম্বন ছিল ওই অঞ্চলের তদ্ভব শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি আশ্রিত কথ্য ভাষা ও কলকাতার মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে ব্যবহৃত সাধারণ ভাষা। তার প্রথম সামাজিক নাটক 'প্রফুল্ল'তে অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল এবং সুখী-সমৃদ্ধশালী একান্নবর্তী পরিবারের ভাঙনের করুণ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

এই নাটকে পাহারাওলা, শুঁড়ি, মাতাল, মুটে, ভৃত্য, খেমটাওয়ালী, পরিচারিকা প্রভৃতি যেসব নিম্নবর্গীয় চরিত্র রয়েছে তাদের সংলাপ অল্প। তবে এই স্বল্প সংলাপের মধ্য দিয়েও তাদের শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য ও ভাষাভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ ভাষা যেমন প্রাণবন্ত, সাবলীল, তেমনি চরিত্রানুগ। আবার বরপণ এবং কৌলীন্য সমস্যার মতো সামাজিক কুপ্রথাকে বিষয় করে লেখা 'বলিদান' নাটকেও গোয়ালা, পানওয়ালা, বেলিক, পাহারাদার, বেহারা, ঘটকী, ঝিগণ প্রভৃতি নিম্নজাতীর চরিত্র ও তাদের সংলাপের ভাষা তীক্ষ্ণ ও যথাযথ হয়েছে। এই সব নিম্নশ্রেণির চরিত্রের সংলাপে উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলের মৌখিক ভাষা ও বাগ্‌ভঙ্গি চোখে পড়ে। আবার দারওয়ান চরিত্রের সংলাপে বাংলা ও হিন্দি শব্দের মিশ্রণে দেহাতি ভাষা দেখা যায়।

উদাহরণ :

১. তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য—(মাঝ, মশই, মিতে, নাওয়া, গোত্র)।
২. ব্যঞ্জনলোপ—(দিয়ে > দে / ঘায়েল > ঘাল / মহাশয় > মশয়)।

৩. স্বরসঙ্গতি—(ভাগ্য > ভাগ্‌গি / অসাধ্য > অসাধি)।
৪. লৌকিক শব্দ—পিপে, বরাত, বাতিক, হুজকি, খান গে, মাগী, ঝাঁকস, মিন্সে, রা (কথা), নেয়ে (স্নানকরা), ঝিনকুটি।
৫. উত্তম পুরুষে 'লুম' যোগে বর্তমান এবং 'তুম' যোগে অতীতকালে ক্রিয়া গঠিত হয় — (এলুম, চললুম, পালালুম, মাজতুম, শুনতুম)।
৬. ঘোষীভবন—(খবর > খপর / নিক > নিগ)।
৭. অল্পপ্রাণীভবন — (গোঁফ > গোঁপ / মাছ > মাচ)।

নাটকের বিষয়বস্তু যেমন, তেমনি নাট্যদ্বন্দ্ব, বাস্তব পরিবেশ, চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আবেগ-অনুভূতি, আচরণ প্রভৃতি সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। সংলাপের মধ্য দিয়েই চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই সংলাপ হল নাটকের প্রাণ। ভাষা ও সংলাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নাট্য চরিত্রের সামাজিক অবস্থান ও মনস্তাত্ত্বিক দিকটি ফুটে ওঠে। শুধু অর্থনৈতিক দিক থেকেই নয়, সামাজিক মর্যাদার বিচারে নিম্নশ্রেণির মানুষেরা অনেকটাই পিছিয়ে পড়া। নাটকে নিম্নবর্গীয় চরিত্রের কথাবার্তা ও সংলাপের ভাষায় সেই সামাজিক মনস্তত্ত্বের রূপটি ফুটে উঠে। জমিদার বা উচ্চশ্রেণির চরিত্রসমূহ চাকর, কৃষক, মজুর, প্রজা, কুলি, মুটে, দারোয়ান, বাবুর্চি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণির পুরুষ মানুষদের যে ভাষা সম্বোধন বা হুকুম করে তাতে অনেকাংশে শ্লেষ, তাচ্ছিল্য, অশ্লীল শব্দ বা গালি মিশে থাকে।

কারণ সেখানে সামাজিক মর্যাদার ব্যবধান বেশি কিন্তু নিম্নশ্রেণির নারী বিশেষ করে ঝি, চাকরানী, ধোপানী, গোয়ালিনী, নাপ্তিনী প্রভৃতি চরিত্রের ভদ্রঘরের অন্দরমহলে যাতায়াত থাকায় ওই সমস্ত পরিবারের স্ত্রী লোকদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতায় মেতে ওঠে, ফলে সেখানে সামাজিক মর্যাদার ফারাক কম। আদুরী, হাবার মা, মতের মা, বা ভগি-সাবি প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য নাটকে সমাজের বিভিন্ন স্তরের নিম্নবর্গীয় চরিত্র যেমন চাকর, ঝি, মুসলমান কৃষক, মুটিয়া, মাতাল, বারাঙ্গনা, জেলে, ধোপানি, খানসামা, মেথর, কৃষক বউ, খেমটাওয়ালি, বেদেনী প্রভৃতি তাদের সংলাপে নিজ নিজ সমাজে প্রচলিত বাক্‌ধারা, লৌকিক শব্দ ও ভাষাভঙ্গিকে প্রয়োগ করেছে। কয়েকটি উদাহরণ থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে যায়—

১. দাসী : তুই যে ঠ্যাকারের কথা কস, তাতেই তোর ভাতার রাগ করে যায়।
২. চাকর : তা মুই অদ্দূরে থাকি আলাম, তা মুখ খাতিও পালাম না, একটু জিরুতি ও পালাম না, তাই মোদের বউ বলে হালো বলে চাকুরী না কুকুরি।
৩. কৃষক বউ : ও পুটিদিদি! মোরে এ কোথায় আনে ফ্যালালি না ভাই মোর বড় ডর লাগে।
৪. মুটিয়া : দেখ মামু, এই হেঁদু বেটারাই দুনিয়াদারির মজা করে ন্যেলে। বেটারগো কি আরামের দিন ভাই।
৫. বারাঙ্গনা : ওলো বামা, ওটা মোল্লা নয় ভাই, রসের বৈরাগী ঠাকুর। যে কুড়োজালি হাতে আছে। আ হা হা মিনের রকম দেখ না।
৬. কৃষক : আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে, খাব কি, বাচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা জমি তো না য্যান সোনার চাঁপা।

সংলাপের মধ্য দিয়ে শুধু সামাজিক অবস্থানই নয়, চরিত্রগুলির আবেগ, লজ্জা, সহানুভূতি, মমত্ব, দুঃখ, হতাশা, দাম্পত্য স্মৃতি, ভয়, চতুরতা, ক্রোধ, প্রতিবাদী মনোভাব প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিক দিকও উদ্ভাসিত হয়। সংলাপ ভাষা চরিত্রের অন্তরলোকের রহস্যকে উন্মোচিত করে। অবস্থা ও চরিত্রের মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষাও বদলে যায়। আমাদের আলোচ্য নাটকগুলিতে নিম্নবর্গীয় চরিত্রগুলি যে ভাষায় দুঃখ, ভয়, লজ্জা, সহানুভূতি প্রকাশ করে তার চেয়ে ক্রোধ, প্রতিবাদ বা ঝগড়ার ভাষা অনেক বেশি জোরালো, তীক্ষ্ণ ও গতিময়। আবার নারী চরিত্রগুলি যখন ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গ-রসিকতা করে। তখন গান, প্রবাদ, অশ্লীল শব্দ ও মেয়েলি ভাবভঙ্গিতে সে ভাষা অনেক বেশি প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

উনিশ শতকে যে সমস্ত বাংলা সামাজিক নাটক রচিত হয়েছিল তা মূলত তৎকালীন সামাজিক, পারিবারিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা এবং সংস্কারমুখী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট। তাই স্বাভাবিকভাবে সেখানে সমাজের সর্বস্তরের চরিত্রের আনাগোনা লক্ষ করা যায়। সেক্ষেত্রে উচ্চশ্রেণিভুক্ত চরিত্রের পাশাপাশি নিম্নস্তর থেকে প্রচুর টাইপ চরিত্র আমদানি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপিত করেছেন নাট্যকারেরা। এক্ষেত্রে তাদের প্রধান অস্ত্রই ছিল ভাষার সাবলীলতা ও বৈচিত্র্যময়তা। বিশেষত নিম্নবর্গীয় চরিত্রের সংলাপ নির্মাণে তারা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। শ্রেণিভেদে ভাষাভেদে এই ঔচিত্তবোধ ছিল বলেই তারা নিম্নবর্গের সংলাপে আঞ্চলিক উপভাষা, সামাজিক উপভাষা ও জনভাষাকে সুচারুভাবে প্রয়োগ করেছেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন। তাই নাটকগুলির ভাষা অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, প্রাণবন্ত ও চরিত্রানুসারী।

তথ্যের সন্ধানে

১. অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় : 'গিরিশচন্দ্র', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৯
২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' নবম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১৫-২০১৬
৩. অজিত কুমার ঘোষ : 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৮
৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস', এ মুখার্জী এন্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
৫. প্রদ্যুৎ সেনগুপ্ত : 'বাংলার সামাজিক জীবন ও নাট্য সাহিত্য', একুশ শতক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
৬. বিপ্লব বিশ্বাস : 'সামাজিক নাটকে সংলাপের গতি প্রকৃতি', অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০০৬
৭. ভবানী গোপাল সান্যাল : 'দীনবন্ধু মিত্রের নাট্য সমীক্ষা', দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ২০০২
৮. দীপঙ্কর মল্লিক : 'বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক ইতিহাস', দিয়া পাবলিকেশন, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১৮
৯. শ্রী বৈদ্যনাথ শীল : 'বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা', মহাজাতি প্রকাশক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ
১০. সাধন কুমার ভট্টাচার্য : 'নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ : এপ্রিল ২০১৭